পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

বিমল কর চারের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত যে সাহিত্য রচনা করে গিয়েছেন, তার মধ্যে তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়েছে। জীবনের পথ চলার সাথে সাথে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে তা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই রচনায় যেমনভাবে চোখে দেখা জগতের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি সেই অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনদর্শনের রসে জারিত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক অনুভূতিময় জগৎ। এই জগতে সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বাস্তব জগতের ওম্ মেখে সাধারণ মানুষের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। তাই কাহিনীর পাশাপাশি চরিত্রগুলিও যথাযোগ্য সময়ের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে।

বিমল করের গল্পে ও উপন্যাসে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা বহুবিধ। জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনের কথা মাথায় রেখে সচেতন সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে ভাবগত ও গঠনগত কিছু পরিবর্তনও এনেছিলেন। এই দিক থেকে তাঁর গল্পগুলি অনেক বেশি বৈচিত্র্যমণ্ডিত। তবে এটাও বলে রাখা জরুরি, তিনি গল্পে যেভাবে মানবমনের অন্তর-রহস্যের সন্ধানী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, এই বৈশিষ্ট্যগুণই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

বিমল কর তাঁর জীবনে পারিবারিক সূত্রে লেখক হয়ে ওঠার তেমন অনুকূল পরিবেশ পাননি। সেজোকাকা ও কাকিমার মধ্যে সাহিত্যের প্রতি খানিকটা অনুরাগ থাকলেও তা সাহিত্য পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিমল কর সেই সুযোগে সাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে মনের সংগোপনে সাহিত্যবোধ গড়ে তুলে ছিলেন। তাই সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে তাঁকে থমকে যেতে হয়নি। চারের দশকে ছোটগল্প রচনার সূত্রপাত হলেও সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি গল্প এই দশকে পাওয়া যায়নি; তবে পাঁচের দশক থেকে তাঁর রচনা সঠিক স্রোতের সন্ধান পায়। বহির্বঙ্গে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি কাটলেও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁর মধ্যে বজায় ছিল। কলকাতায় কলেজে শিক্ষা লাভের জন্য আসা, বহুবাজারের বাড়ির দাদামণি-- দেবীপ্রসাদ করের সাহচর্য সেই

সাহিত্যবোধকে আরও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। তাই বেনারস, আসানসোল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে কর্মসূত্রে থাকতে হলেও সাহিত্য রচনার প্রতি অনুরাগ তাঁর কমেনি। সাহিত্যের তাগিদেই তিনি কলকাতায় অনিশ্চিত আর্থিক-জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। দারিদ্র্য, আর্থিক স্থিতাবস্থার অভাব তাঁর মনে খুব বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। বোহেমিয়ান জীবন, বহু মানুষের সাথে মেলামেশার সুযোগ, তাদের জীবনধারা, বয়ে চলা সময়ের নানা ঘটনাপ্রবাহ বিমল করের সাহিত্যের ইমপ্রেশ্যন হয়ে উঠেছে। জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর অনুসন্ধিৎসার ফলে বিমল করের সামনে উপস্থিত হয়েছিল নানান দার্শনিক জিজ্ঞাসা। তাঁর শিল্পকীর্তির মূলে রয়েছে এই দার্শনিক জিজ্ঞাসার নানা স্তর।

বিমল কর চারের দশকে যে সময় তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন তখন সমকালীন পরিস্থিতি ছিল অস্থির। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মন্বন্তর, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দেশভাগ, দাঙ্গা, এর পর প্রাপ্ত স্বাধীনতা, সর্বত্রই ফুটে উঠেছিল অসুস্থতার ছবি। দেশ-কাল-মানবিক সম্পর্কের এই অসুস্থতা, বর্ণহীনতা তাঁর গল্পের 'ইমপ্রেশ্যন' হয়ে উঠেছিল। কথাসাহিত্যে 'ইমপ্রেশ্যন' সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক ও সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন--

''খুব সহজ করে সাধারণত বলা হয়-- ছোটগল্প তৈরি হয় ইমপ্রেশ্যন থেকে। যে কোন শিল্পবস্তুই তো ইমপ্রেশ্যন সঞ্জাত। উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে যে কোন একটি বিস্তৃত জীবনভূমি আমি রচনা করতে পারি, গড়ে তুলতে পারি সংঘাত সংক্ষুব্ধ সুবিশাল একটি মানব নাট্য; কিন্তু বিচিত্রমুখী এই জৈবনিক চঞ্চলতা -- এই নটলীলা-এরা নিয়ন্ত্রিত হবে কিসের দ্বারা? এই বিবিধ ব্যক্তি সমাবেশ, তাদের বহুমুখী এবং অন্তশ্চারী ঘাত-সংঘাত আর গহন-চারণা এগুলো কি সব দেখানো যায় বিশুদ্ধ রিপোর্টাজে-- অদলীয়, অপক্ষপাত সাংবাদিকের মতো? এ রকম ঐশ্বরিক নিরাসক্তি নিয়ে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন শিল্পকীর্তি গড়ে ওঠেনি -- সহস্র সমালোচকের স্বীকৃতি-পত্র থাকলেও তা মান্য নয়। যে কোন শিল্পকৃতিতে সমুত্তীর্ণ মহৎ উপন্যাসই অদ্যাবধি তার ঘটনাপুঞ্জে, চরিত্র সংঘাতে এবং সিদ্ধান্ত বাক্যে -- সংশ্লিষ্ট স্রষ্টার জীবন সম্পর্কিত কোন উপলব্ধিতে, কোন দার্শনিক চেতনায়, কোন নতুন সমীক্ষায় উদ্ভাসিত এবং চালিত হয়েছে। মহাভারতের 'মহাপ্রস্থান পর্ব' যেমন চক্রান্ত কুটিলতা যুদ্ধ রক্তপাতের বিপুল ভৈরব রঙ্গের পর এক বিষণ্ন মৌনের ধূসরতায় প্রশান্ত হয়ে আসে, তেমনি কোন পরিব্যাপ্ত সার্থক উপন্যাসও এই

রকম যে কোন একটি বোধির মধ্যে উত্তীর্ণ হতে চায় -- আর সেও হল জীবন, মানুষ, সমাজ কিংবা বিশ্বনীতি সম্পর্কে লেখকের ইমপ্রেশ্যন।''[১]

বিমল করের গল্পে ও উপন্যাসে লেখকের মানবজীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানবমনের গভীর গোপনচারী মনের বৈচিত্র্যের নিরিখে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য তাই মানুষের দ্বান্দ্বিক মনের স্বরূপ সন্ধানে, জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্যময় অনুভবে, জীবনের জটিলতার সাথে একাত্ম। ছোটগল্পে তাঁর 'ইমপ্রেশ্যন' তাঁর অনুভববেদ্য জীবনদর্শনের সাথে তাই সহাবস্থান করেছে প্রতিদিনের চেনা-জানা জগতের গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে টুকরো টুকরো যে জীবনানুভূতি তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপ দিলেন সেখানে সমকালীনতার আবর্তে অসহায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযুদ্ধ ও জীবনানুরাগ বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ পেল। তাঁর গল্পে যে বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তার মূল ভিত্তি ব্যক্তিমানুষের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার নানা বৈচিত্র্য অবলম্বন করে রয়েছে।

বিমল করের সমকালে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রেও এই মনস্তত্ত্ব নির্ভরতা চোখে পড়ে। যে ছবি তাঁদের প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দেখা গেছে অস্থির বাহ্যিক পরিস্থিতি মানুষের মনেও সৃষ্টি করেছে অস্থিরতা, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা অপারগ। জীবনের প্রবাহে তারা ভেসে চলেছে খড়কুটোর মত, প্রতিবাদ করার মত মানসিক জোর তারা যেন হারিয়ে ফেলেছে। আর বাহ্যিক জগতে যখনই মানুষ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, ততই অন্তর্জগতে উঠেছে প্রবৃত্তির ঝড়। বেঁচে থাকার মৌল প্রয়োজনের পাশাপাশি মধ্যবিত্ত মানুষ খুঁজেছে অতিরিক্ত সুখের সন্ধান। সব সময় আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা না ঘটায় অসহায় মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠেছে। বিমল করের গল্পেও এই মানুষের ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির মানদণ্ডে তারা আবর্তিত হয়েছে। পাপ-পুণ্যের বোধ মানসিক বিভ্রান্তি, আত্ম-আবিষ্কারের আকুলতা, প্রেম-মনস্তত্ত্বের জটিলতার পাশাপাশি বিপন্নতার চিত্র তাদের জীবনকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে তুলেছে সমকালীন সমাজ ও মানুষের সান্নিধ্যে থেকে। বিমল করের শিল্পকীর্তি গড়ে উঠেছে এই ভাবনার সাথে সংযুক্ত হয়ে।

বিমল করের গল্পে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লেখকের জীবনদৃষ্টিকে প্রকাশ করে তার মধ্যে প্রধান মানবিক সম্পর্কের বিষয়। মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্কে দুটি দিক এখানে প্রকাশ পেয়েছে। একটি হল দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে মানবিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠা মানবিক

সম্পর্ক, অপরটি দাম্পত্য সম্পর্ক। প্রথম শ্রেণীটিতে লেখকের ভাবনা সমকালীন- তার প্রেক্ষাপটে নতুন আর্দশ সৃষ্টি করতে পেরেছে। অস্থির সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব বাঁচানোর তাগিদে ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল, বিমল কর সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মানবিক সম্পর্ককে গড়ে তুললেন। এই সম্পর্কে মানুষের মনস্তত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তায়, ভালবাসা ও সৌহার্দ্যের নিবিড়তায়। 'সম্পর্ক' গল্পে শৈলেশ ও অনিলার মধ্যে সম্পর্ক আত্মীয়তার। দাম্পত্য সম্পর্ক ব্যতিরেকে দুটি চরিত্র মানবিক মূল্যবোধের দৃঢ়তায় একে অপরের সান্নিধ্য কামনা করেছে। একসাথে সহাবস্থানের মাধ্যমে তাদের মনে শান্তি ও স্বস্তির আবহ সৃষ্টি হয়েছে। 'নিশীথ সঙ্গী' গল্পে কিশোরীলাল ও সাধনা একই বাড়িতে অবস্থান করেছে, যেখানে তাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে মানবিক, কোন আত্মীয়তা বা রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই। ধর্ষিতা মেয়ে সাধনাকে জ্ঞানহীন অবস্থায় উদ্ধার করে কিশোরীলাল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঠাঁই দেয় নিজের ঘরে। এই গল্পে আরও একটি মেয়েকে অসুস্থ অবস্থায় দেখা যায় রেলস্টেশনে। কিশোরীলাল, রতিকান্ত, অমলজ্যোতিরা আইনের পরোয়া না করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের সাহায্য সহানুভূতি, আত্মিক সম্পর্ক বিমল করের গল্পে এইভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'সহযাত্রী' গল্পে শতদলের 'বউমা'(মা)-অনুপমা ও হেমকাকার সম্পর্কও মানবিক সম্পর্কে আবদ্ধ। হেমকাকার বার্ধক্যের দিনগুলিতে সাহায্য ও সহানুভূতির তাগিদে অনুপমা নিজের সংসার, পুত্র-কন্যা, সমাজ থেকে সরে এসে মানবিকতার শর্তে হেমকাকার সাথে সহাবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অসুস্থ, দুর্বল, অসহায় মানুষের কাছে এসে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে বিমল কর মানুষের মানবিকতাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন। এই মানুষেরা এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সামাজিক পুরস্কার বা জয়ধ্বনির কামনা করেনি, আত্মিক স্বাবলম্বন ও বিশুদ্ধতাকেই যেন প্রকাশ করেছে। মানুষকে সাহায্য ও বিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরতত্ত্বকে অনুভব করেছে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের চরিত্রেরা। 'নিশীথসঙ্গী' গল্পে কিশোরীলালের মনে এসেছে পাদরিবাবার কণ্ঠে উচ্চারিত বাইবেলের বাণী -- ''No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.''[২]

বিমল করের গল্পে যে ঈশ্বরভাবনা প্রকাশিত হয়েছে তার মর্মমূলে রয়েছে মানুষের প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাস। এর দ্বারাই তাঁর চরিত্রেরা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। 'মানব পুত্র' গল্পে কেষ্ট গঙ্গামণির কাছে সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে দেবত্বে উত্তীর্ণ

হয়ে উঠেছে। অন্তঃসত্ত্বা গঙ্গামণির সামনে তুলে দিয়েছে নিজের ভাগের খাবার। মদনবাবু গঙ্গামণিকে আক্রমণ করে সাধু সাজার প্রত্যাশায় পুলিশের কাছে গেলেও কেষ্ট গঙ্গামণিকে পরিত্যাগ করে চলে যায়নি। যিশুর ছবির দিকে তাকিয়ে মানবপুত্রের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছে।

'মানব পুত্র', 'বরফ সাহেবের মেয়ে', 'নিশীথ সঙ্গী', 'বুদবুদ' এমনি বহু গল্পে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি লেখকের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের আচ্ছন্নতা তাঁর ছিল না। উদার ধর্মীয় মানসিকতায় তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাই ধর্মের আচারসর্বস্বতা তাঁর মধ্যে ছিল না। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এই কারণে কেষ্ট, জিনি, বেলা, কিশোরীলালের মত বহু চরিত্রের খ্রীষ্টধর্মের মানবিক ভাবনার প্রতি আশ্রয় গ্রহণের প্রবণতাকে তিনি বর্ণনা করেছেন। লুক, মথি, যোহনের সমাচার পাঠ করে এবং নানা সময়ে পাদরিদের সান্নিধ্যে এসে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন খ্রীষ্ট ধর্মের উদার মানবিক তাৎপর্য। আচার-সর্বস্বতার প্রকাশ বিহীন এই ধর্মভাবনা তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তাই 'খড়কুটো' উপন্যাসে যেমন খ্রীষ্টধর্মের কথা ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমনি কয়েকটি গল্পের মাধ্যমেও লেখক সেই ভাবনাকে মূর্ত করে তুলেছেন।

দাম্পত্য সম্পর্কের উপর বিমল করের বহু গল্প রচিত হয়েছে। এই গল্পগুলির মধ্যে দুটি দিক দেখা যায়। একটি শ্রেণীতে রয়েছে দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের কথা অপর শ্রেণীতে সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার কথা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক পটভূমিতে যখন বেঁচে থাকার জৈবিক প্রয়োজন মুখ্য হয়ে উঠেছিল, অস্তিত্বের সংকট ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল সেই সময়ে মানুষের প্রতি মানুষের অনাস্থাও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। দাম্পত্য সম্পর্কেও তাই ফাটল লক্ষিত হচ্ছিল। আধুনিক যন্ত্রণাকাতর বিশ্বে প্রতিটি মানুষ স্বতন্ত্র বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে শুধু নিজস্ব চিন্তা ভাবনার মধ্যেই আবৃত হয়েছে, পার্শ্ববর্তী মানুষের সাথে তার মানসিক দূরত্ব ক্রমে বর্ধিত হয়ে গেছে। 'জানোয়ার' গল্পে সুধীবন্ধু সোম ও তার স্ত্রী অতসীর মধ্যে জন্ম নিয়েছে ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহা। অতসী স্বামীর অমানবিক বাবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে আত্মবঞ্চনার মাধ্যমে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে তুলেছে। 'বাঘ' গল্পেও শচী ও অচিন্ত্য পৃথক জগতের বাসিন্দা হয়ে উঠেছে একই ছাদের তলায় থেকেও। 'পালকের পা' গল্পে মিত্রসাহেব ও তুষারকণা, 'শীতের মাঠ' গল্পে অতসী ও নবেন্দু, 'আয়োজন' গল্পে মনোবীণা ও পশুপতির সম্পর্ক প্রভৃতি বহু উদাহরণ উপস্থাপিত হতে পারে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্রমক্ষীয়মাণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই চরিত্রগুলি

মানসিক চাহিদার তাগিদে ক্রমশ মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়ে উঠেছে। মনস্তত্ত্বের গূঢ় আবর্তনের জালে এরা নিজেরাই বন্দী হয়ে এক যন্ত্রণাময় পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে উঠেছে। পরিবারতন্ত্রের ভাঙন, দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা, প্রেমাস্পদের প্রতি সন্দেহপ্রবণতা এবং তার নিরিখে আত্মপ্রবঞ্চনার রূঢ়, বিসদৃশ জগতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঘটনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই গল্পগুলি। একান্ত বাস্তবসম্মতভাবে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে লেখক রূপ দিয়েছেন এই গল্পগুলিতে, যা সমকালীনতার চিত্র হয়ে উঠেছে।

দাম্পত্য সম্পর্কের এই জটিলতার চিত্র অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক, দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থ, সাবলীল, বিশ্বাসবোধের চিত্রও প্রকাশ করেছেন এবং লেখকের প্রবণতাও আবর্তিত হয়েছে এই বিশ্বাসের চিত্র রচনায়। সনাতন ভাবধারার প্রতি তাঁর ঔৎসুক্য ছিল। দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসবোধের শক্ত জমি তিনি প্রোথিত করতে চেয়েছেন। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ছবি পরিলক্ষিত হয় 'সোপান' গল্পের সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রীর মধ্যে, 'তুচ্ছ' গল্পের বরদা ও কাননের মধ্যে, 'সুখ' গল্পের বরদাকান্ত এবং সুবর্ণ কিংবা 'এরা ওরা' গল্পের হেমদাকান্ত ও সুশীলার মধ্যে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক নির্ভশীলতার যে ছবি লেখক প্রয়োগ করেছেন তাঁর গল্পে, তাঁরা প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ দম্পতি। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানসিক আশ্রয় লাভের মধ্য দিয়ে তাঁরা বেছে নিয়েছেন তাঁদের জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনীকে। দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের ভালবাসা ও বিশ্বাসের সুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরও যেন নিবিড় হয়ে উঠেছে। একজনের ব্যতিরেকে অপর জনের উপস্থিতি যেন ভয়াবহ নিয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে 'সংশয়' গল্পের সুধাকান্ত ও সুনয়নীর কথাও উল্লেখ্য। মৃত্যুর আবহ এখানে তাঁদেরকে পীড়া দিয়েছে। সুধাকান্ত শেষ বিদায়ের সময় সুনয়নীর কাছে কী উপহার পেতে পারেন তা তার মনে জিজ্ঞাস্য হয়ে উঠেছে-- ''আমি যদি আগে যাই তুমি আমায় কি দেবে?''[৩] আবার 'সুখ' গল্পে শুভেনের কল্পনার মাধ্যমে দেখা যায়-- সুবর্ণর শেষ যাত্রার চিত্র-- ''বরদাকান্ত পিছু পিছু চলেছেন। আস্তে আস্তে, একা একা, চোখ দুটি খাটের দিকে।''[৪] 'তুচ্ছ' গল্পেও স্বামী-স্ত্রীর অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক তাদের জাগতিক জীবনকে করে তুলেছে মধুর, স্বচ্ছন্দ, অবিনাশী প্রেমের সৌন্দর্যে উজ্জ্বল-- ''এ রকম হয় সংসারে, হয়; আপন জনের মধ্যেও একজন কেমন করে যেন আরও আপন হয়ে ওঠে, নিজের হৃদয়ের সবটুকু জায়গা জুড়ে নেয়, মিশে যায় সর্বাঙ্গে। কখনও কখনও মনে হয়, অন্য মানুষটির নিঃশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে থেকে উঠে এল।''[৫]

আধুনিক জীবনের চাওয়া-পাওয়ার আর্তি যেখানে প্রবল, স্বার্থপরতার, কৃতঘ্নতার আবিলতা যেখানে দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও চিড় ধরিয়ে দিচ্ছে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নর-নারী যেখানে নিজস্বভাবনায় বন্দী থেকে একবিন্দু জমি ছাড়তে রাজি নয়, সংসারে অধিকার বলবৎ করার প্রচেষ্টায় একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সে জায়গায় বিমল করের গল্পে দাম্পত্য জীবনের পারস্পরিক বন্ধনের ছবি জীবনের আস্থা-বিশ্বাসের সুরকে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে। সমকালীন গল্পকার কিংবা কবিরা হতাশার ছবির মধ্যেও জীবনের সনাতন সুরকে খুঁজে নেওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন অতীতচারণার মাধ্যমে, নস্টালজিক চিন্তার বন্ধনে, ইতিহাস চেতনার অলিন্দে। অতীতকে গৌরবান্বিত করে বর্তমানের সাথে তার তুলনা করে বর্তমান জীবনের ক্লীবত্বকে প্রকাশ করেছিলেন। বিমল কর বর্তমানের মধ্যেই দেখালেন জীবনের সেই বিশ্বাস ও প্রত্যয়। জীবনে পথ চলার মাধ্যমেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রেরা খুঁজে পেল স্থির বিশ্বাসের ও প্রত্যয়ের জমি। আত্মশুদ্ধির আকুলতায় তারা নিজেদের পরিবর্তিত করতে চাইল। ধূসর অতীতের থেকেও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেল চোখে দেখা জগতের বাস্তব উদাহরণ। 'সুখ' গল্পে শুভেন ও মীনার মধ্যে সেই আত্মশুদ্ধির প্রবণতা লক্ষিত হল। বরদাকান্ত ও সুবর্ণের দাম্পত্য জীবনের প্রেম ও সহযোগী মানসিকতা তাদের মনে আত্মানুসন্ধানের ভাবনাকে জাগ্রত করে তুলল। 'সোপান' গল্পে হেমদা এবং রেণু'র দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙনের পাশাপাশি সুরেশ্বর মজুমদার এবং তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য বন্ধনকে লেখক তুলনামূলক স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিমল করের গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার প্রভাব তাঁর জীবনদৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। আধুনিক সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও বিমল কর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে তাঁর গল্প ও উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের গূঢ় ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি তাদের মনস্তত্ত্বের কারণেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, স্বকীয় ভাবনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। কখনও বা মনস্তত্ত্বের কারণে সংবেদনশীল মানুষে পরিণত হয়েছে, আবার কখনও বা জনসমুদ্রের মধ্যেও হয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গ। অন্তর্লোকের জগৎ প্রতিটি মানুষের কাছে যেমন চেনা, তেমনি অচেনা। এই অচেনা জগতে সে পদার্পণ করতে না পারলেও, তার দ্বারা চেতন স্তরেই সে প্রভাবিত হয়ে পড়ে নিজের অজ্ঞাতেই ভুলের শিকার হয়। আবার কখনও মনের সুপ্ত বাসনা মানুষের অন্তরকে কুরে কুরে খায়, তাকে ব্যথাদীর্ণ করে তোলে। তাই আধুনিক লেখক হিসেবে বিমল কর অন্তর্লোকের অপ্রতিরোধ্য জগৎকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন তাঁর গল্পের মাধ্যমে। মানুষের টুকরো টুকরো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা যা মনস্তত্ত্বের

জটিলতায় জীবনের অর্থকে বদলে দিতে পারে সেই ছোট অথচ গভীর ভাবনাগুলি তিনি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোটগল্পের 'Singleness of aim' শর্তের অনুসারী করে তাঁর ভাবনাগুলিকে তিনি জীবন্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই গল্পগুলিতে যেমন যুক্তির প্রাধান্য প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মানব মনের রহস্যময়তা হাজার জিজ্ঞাসা নিয়ে এসেছে। মানব মনের এই অনালোকিত অধ্যায় তাঁর গল্পগুলিকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য।

'মোহনা' গল্পে মোহনার মুখে শোনা গিয়েছিল অন্তর্চারী সেই মানুষের কথা, যাকে বাইরে থেকে উপলব্ধি করা যায় না। ''আমি ভাই মনটাকে একটা মানুষ বলি--ভেতরের মানুষ। তুই কোনদিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভাল বুঝবি না, অথচ সে তোকে আড়াল থেকে কোথায় যে চালিয়ে নিয়ে যাবে তুই জানিস না।''[৬] --এই 'ভেতরের মানুষের' দ্বারাই মানুষ পাপ-অন্যায়ের পথে ব্রতী হয়। কখনো তার জন্য মনে অনুশোচনা জাগে, কখনও বা জাগে আত্মশুদ্ধির আকুলতা। বিমল কর লিখেছিলেন, ''ফ্রয়েডের তত্ত্ব, পাপ তত্ত্ব, শয়তানের তত্ত্ব -- একথা যদি বলেন এবং প্রশ্ন করেন, এতো পাপ লুকিয়ে নিয়ে আমরা আছি? শারকের একটি প্রিয় কথা ব্যবহার করে ফ্রয়েড যে জবাব দিতেন আমাকেও সেই জবাব দিতে হবে-- 'That dose not keep it from existing' যা আছে তা হয়তো দুর্বিষহ কিন্তু যা আছে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করবার নয়।''[৭] --বিমল কর মনস্তত্ত্বের এই গূঢ় জটিলতাকে তাঁর গল্পে রূপ দিয়েছেন। জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়ও ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব, স্বপ্ন-তত্ত্ব বিশেষ স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু বিমল কর মানুষের মনের অনালোকিত জগতে সন্ধানী আলো ফেলার চেষ্টা করেছেন।

''ইঁদুর' গল্পে মলিনার সাথে যতীনের দাম্পত্য সম্পর্ক সুখের। তবুও ইঁদুর-রূপী অবৈধ কামনা কেমন ভাবে তার মনে এসে তার সর্বনাশ ঘটানোর চেষ্টা করেছে তা মলিনার কাছে অজানা। যতীনের অনুপস্থিতি বাসুদেবের প্রতি তাকে উৎসাহী করে তোলার পরিবেশ রচনা করেছিল। অবচেতন মনে বাসুদেবের প্রতি তার যে কামনার প্রশ্রয় ছিল তা সুপ্ত, তবুও তারই কারণে সে ইঁদুরকলে বাধা পড়ে তার অন্তর স্বরূপ কে চিনে নিতে পেরেছে। 'বকুল গন্ধ' গল্পে অঞ্জনা বিবাহিত জীবনেও শ্যামলের প্রতি তার অনুরাগকে চাপা দিতে গিয়ে অবচেতনের দ্বারা চালিত হয়ে নিজের কাছেই নিজে রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। 'পলাশ' গল্পে রতিকান্ত বিনুর প্রতি স্বামীসুলভ ভালবাসা টিকিয়ে রেখেও উমার প্রতি গোপন ভালবাসায় ক্ষতবিক্ষত হয়। 'সুধাময়'

গল্পে সুধাময় রাজেশ্বরী, হৈমন্তীর মধ্যে খুঁজে ফেরে ভালবাসা ও পূর্ণতার তত্ত্ব। সুধাময়ের মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তাকে মানসিক দিক দিয়ে স্থিরতা দেয় না, 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন', 'সম্পর্ক', 'আয়োজন', 'গুণেন একা' এই রকম বহু গল্পে চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তাদের চেনা পৃথিবীর মধ্যেও অচেনা করে তুলেছে। প্রাত্যহিক জীবন থেকে তারা ক্রমশ নিঃসঙ্গতায় ডুবে গেছে। কখনও এই সূত্রে তাদের মনে এসেছে বিষণ্নতা, মৃত্যুভাবনা, মৃত্যুভয়।

মৃত্যুভাবনা বিমল করের সাহিত্যের একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তিনি যে মৃত্যু দেখেছিলেন তার মাধ্যমে মৃত্যুভয় তাঁর মনে বিশেষ স্থান করে নেয়। চল্লিশের দশকে যুদ্ধ-দাঙ্গা-মন্বন্তরে অজস্র মানুষের মৃত্যু যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের অনিশ্চয়তা। মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে, শেষ হয়ে যায় সমস্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতি দুর্বলতা, মৃত্যু এখানে নিয়তির স্বরূপে দেখা দিয়েছে। মানুষের জীবনের উপর তার ভয়ঙ্কর ক্ষুধার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ ঘুমন্ত স্ত্রীর প্রতি তাকিয়ে নিজের মনে মনে ব্যক্ত করতে চেয়েছে, ''আমাকে বুকের কাছে এক মুঠো গেঞ্জি ধরে তুমি আমায় আটকে রাখবে কমলা।... আমি ভুবনের মতন এই মুহূর্তে চলে যেতে পারি। তুমি মুঠো খুলবে যখন, তখন দেখবে আমি নেই।''[৮] লেখকের মনে মানুষের জীবন এই রূপ ক্ষণস্থায়ী এবং অনিশ্চিত স্বরূপে ধরা দিয়েছে। মুঠো ভরে ধরে রাখার প্রত্যাশা থাকে মানুষের আবার মুঠো খোলার সাথে সাথে যেন হারিয়ে যায় সহসা সেই আকাঙ্ক্ষিত জীবন। 'অশ্বত্থ' গল্পে রেণুর বুক খালি করে চলে গেছে তার সন্তান -- রেণুর জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার, যন্ত্রণার ভারী পাথর। 'নিষাদ' গল্পে জলকু ক্রমশ এগিয়ে গেছে নিয়তি-রূপী মৃত্যুর কাছে। আবার প্রথমদিকে লেখা গল্প 'অম্বিকানাথের মুক্তি'তে জাগতিক বন্ধন ছেড়ে যে মানুষটি মৃত্যুর কাছে যেতে চায় না, তারও ঘটে অনিবার্য মৃত্যু।

এই মৃত্যুভাবনায় বিমল করের গল্পে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পাঁচের দশক থেকে তাঁর গল্প অনেক বেশি বিশ্লেষণমুখী হয়ে ওঠে এবং নানা দার্শনিক জিজ্ঞাসা তাঁকে আলোড়িত করে তোলে। প্রথম দিকের গল্পে যে মৃত্যুর চিত্র রয়েছিল, তা জাগতিক মৃত্যু -- তা স্বাভাবিক, বিধিবদ্ধ। কিন্তু পরবর্তী কালে মানব চরিত্র, মানবমন ও মানবজীবন নিয়ে নানা জিজ্ঞাসায় আলোড়িত বিমল কর উপলব্ধি করলেন আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা, অসহায়তা, ক্লীবত্ব। এখানে বেঁচে থাকা মৃত্যুর মত ভয়াবহ। জীবনের যথার্থ মানে খুঁজে ফেরা মানুষ অসহায় ভাবে নিজেকে

শেষ করে দিচ্ছে প্রবহমান সময়ের কাছে। আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পথ হারাচ্ছে। 'সুধাময়' পর্বে এসে বিমল কর কিছুটা পথ খুঁজে পেলেন। 'সুধাময়ে'র মধ্যে এই অন্বেষণ পর্ব শেষ হয়নি বটে তবুও মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে বিশ্বাস ও প্রত্যয়। ''সুধাময়' গল্পের পর থেকে কয়েক বছর আমি যা লিখেছি তার বার আনাই দ্বিধা, সংশয়, ভয়, এবং উদ্‌বেগ অসহায়তার কথা। তার গ্লানি এবং পাপের কথা,''[৯] --তাই পরবর্তী গল্পগুলির মধ্যে মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রোথিত মানুষের মনের হতাশা, দ্বিধা, সংশয় চরিত্রগুলির মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। 'সংশয়', 'অপেক্ষা', 'জননী', 'সোপান' প্রভৃতি বহু গল্পে মনস্তাত্ত্বিকতার পাশাপাশি মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনা রূপ পেয়েছে।

কিছু মৃত্যুর ঘটনাপ্রবাহ চরিত্রের আত্ম-আবিষ্কারের প্রবণতার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। কখনও বা ধ্রুব-সনাতন বিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে নিজেকে স্বচ্ছ, নিষ্পাপ প্রমাণ করার তাগিদ প্রদর্শিত হয়েছে চরিত্রগুলির মধ্যে। 'আত্মজা' গল্পে মানসিক ভাবে ক্ষতবিক্ষত হিমাংশু নিজের নিষ্পাপ মনকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। মেয়ের প্রতি তার দুর্বলতা যৌন-কেন্দ্রিক নয়। তবুও বাইরের মানুষের দ্বারা আরোপিত 'কমপ্লেক্স' -এর দায় থেকে সে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছে। পুতুলের প্রতি তার ভালবাসাকে সে কালিমা-লিপ্ত করতে চায় না। কারণ যে মুহূর্তে তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, সেই মুহূর্তে সে সন্দেহাতুর মনকে খুন করতে চেয়েছে নিজে আত্মঘাতী হয়ে। 'হেমাঙ্গের ঘরবাড়ি' গল্পে হেমাঙ্গ আত্মহত্যা করেছে কারণ সে পায়রার কৃত্রিম মানসিকতার মধ্যে বাঁচতে চায় নি। জীবনে বেঁচে থাকার সাধ তার মিটে গেছে যখন জীবনের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়েছে বলে তার বিশ্বাস জন্মেছে। তাই এই গল্পগুলিতে আত্মহত্যা দেখানো হলেও তা জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতার অনুসারী নয়। স্বচ্ছ, ধ্রুব, অকৃত্রিম জীবনবোধের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে।

বিমল কর অবশ্য হিমাংশু বা হেমাঙ্গের মধ্যে সমস্যার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার পথ দেখাননি, তাদের কাছে মৃত্যু আশ্রয় হয়ে গেছে। মৃত্যু তাদের কাছে প্রতিবাদের পথ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কারণ তাদের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে বেঁচে থাকাতো শুধুই বাঁচার লক্ষণ হয়ে থাকতো। সচেতন, শুভবাদী মানুষ আত্মিক ভাবেও বেঁচে থাকতে চায় -- সেই বেঁচে থাকাতেই সুখ -- সেই বেঁচে থাকাই মানুষের মত বাঁচা। তিনি স্বীকার করেন -- ''মৃত্যুর ইচ্ছা বা ডেথ্ উইস এ যুগে একটা মারাত্মক, বিস্তৃত ব্যাধির মতন জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে -- ...এর দুটি কারণ সম্ভব। এক

আত্ম সংরক্ষণে অতিসচেতন এ যুগের মানুষ হয় নিরন্তর কোন কোন পাপ বোধের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে শেষ পর্যন্ত শান্তির আশায় মৃত্যুবরণ করতে চাইছে। আর না হয় একালের সমাজ-রাষ্ট্রজীবনে সর্বতোভাবে হতাশ, বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিরুপায় সান্ত্বনা হিসেবে অনেকটা আত্মহত্যার সামিল, চোখ কান বুজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে মৃত্যু গহ্বরে।.... বলতে কি এমন একটি ভৌতিক যুগে আমরা বাস করছি-যে যুগে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। বিশ্বাস, নীতি, ধর্ম, কল্যাণবোধ, জীবন সৌন্দর্যের ধ্যান-- কী না।''[১০] তবুও এই ছবির পাশাপাশি জীবনের প্রতি অনুরাগও তাঁর কয়েকটি গল্পে প্রদর্শিত। 'নদীর জলে ধরা ছোঁয়ার খেলা' গল্পে নন্দকিশোর মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে জীবনেরই তাগিদে।

অর্থাৎ জীবন যতই দুর্ভর হয়ে উঠুক না কেন মানুষ বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় তাকে আরও রঙিন আরও সুন্দর করে গড়ে তোলে এই তথ্য লেখক পরিবেশন করেছেন। অর্থাৎ বিমল করের গল্পে একটি বিশেষ প্রবণতা উপলব্ধ হয়, তা হল, তিনি জীবনের প্রতি অনুরাগ পোষণ করেছেন। কিন্তু সেই জীবন চেয়েছেন সুন্দর, শুভময়, আনন্দস্বরূপে। আধুনিক জীবনের যন্ত্রণার আবহ থেকে তাই তিনি জীবনকে দিতে চান অমৃতের আস্বাদ-- বেঁচে থাকার উন্মাদনা। শুধুই ধ্বংস বা ক্ষয়িষ্ণুতা নয় মূল্যবোধের প্রতি চিরন্তন দুর্বলতা, মানুষের প্রতি মানুষের সাহায্য, সহানুভূতি তাঁর বহু গল্পেরই বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর সৃষ্ট কিছু চরিত্র তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করেছে, পাপবোধে আক্রান্ত হয়ে নিজেকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছে-- এখানেই প্রকাশিত হয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। 'নিষাদ' গল্পের কথক অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হয়ে জলকুর মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পে তিন প্রেমিক শিবানীর মৃত্যুর পর তাদের দায় স্বীকার করে মৃত আত্মার কাছে হয়ে উঠেছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মৃত্যুভাবনার পথ ধরেই বিমল করের গল্পে দেখা দিয়েছে পরাবাস্তব জগৎ ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের মধ্যে একাত্মতা। অনেক সময় প্রকৃতি প্রতীকের মর্যাদায় আবির্ভূত হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে এবং চরিত্রের পরাবাস্তব জগতের সাথে সেতু নির্মাণ করেছে। 'অপেক্ষা' গল্পে শিবতোষ প্রকৃতির মধ্যে খুঁজে পায় একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতার আবহ। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা যেন মৃত্যুর রূপকে তার কাছে হাজির হয়, নিয়তির মত প্রবল রূপ ধরে এগিয়ে আসে 'ঝড়ো হাওয়া'। আবার শিবতোষের মনে হয় নীচের সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে, তার মন অজানা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। চেতন জগৎ ও পরাবাস্তব জগৎ এই ক্ষেত্রে একাত্ম হয়ে গেছে। 'নিষাদ' গল্পে

অবচেতনের দ্বারা তাড়িত হয়ে গল্প-কথক টিলার উপর উঠে এসেছে, যেখান থেকে রেললাইন দেখা যায় -- জলকু যেখানে মারা গেছে। চাঁদের আলোর স্বচ্ছতার সাথে সাথে তার মনেও স্বীকারোক্তির আকুতি জেগে ওঠে, জলকুর মৃত্যুর কারণ কিছুটা হলেও সে-ই। 'শীতের মাঠ' গল্পের নবেন্দুর মনের নিঃসঙ্গতার সাথে মিলে যায় প্রকৃতির আবহ। স্বপ্ন-কামনা-অবচেতনের দ্বারা নবেন্দুর জগৎ আবর্তিত হয়। 'গুণেন একা' গল্পে আত্মরক্ষার তাগিদে ছুটে চলা গুণেন অনুভব করে বুনো কুকুর তার দিকে এগিয়ে আসছে, আসলে তা কুকুর নয়, গুণেনের পরাবাস্তব জগতে জাগ্রত মূল্যবোধ। মানসিক অন্ধকারের মধ্যে সেই মূল্যবোধ জেগে থেকে গুণেনকে ফিরিয়ে আনে তার প্রকৃত অবস্থানে। 'সোপান' গল্পেও দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে পথ খুঁজে ফেরে বাঁচার অভিলাষে আক্রান্ত মানুষেরা। এই অন্ধকার প্রবৃত্তির অন্ধকার, যেখানে জীবনের শুভবোধ, সঠিক মূল্যবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তব-পরাবাস্তবের পাশাপাশি অবস্থান বিমল করের গল্পকে সমকালীন গল্পকারদের সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে --একথা বলা যায়।

বিমল করের গল্পে ব্রাত্যজীবনের ছবিও তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করেছে। অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা তাদের জীবনের তাগিদ ও প্রত্যাশা নিয়ে সমাজের অংশ হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনের প্রতিষ্ঠা বারবার ব্যাহত হয়েছে সভ্যসমাজের আক্রমণে। 'মানবপুত্র" গল্পে কেষ্ট বা গঙ্গামণি সমাজে শোষিত, বঞ্চিত হয়েছে। 'আঙুরলতা' গল্পে আঙুরলতা সমাজের সভ্যমানুষদের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে, কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে লেখক যে মানবিক মূল্যবোধ প্রকাশ করেছেন, জীবনের প্রকৃত রূপ ও রহস্যকে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আঙুরলতা ব্রাত্য হতে পারেনা -- সভ্য সমাজের সচেতন নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। তবুও কেষ্ট কিংবা আঙুরলতা এই সমাজের যূপকাষ্ঠে বলি-প্রদত্ত হয়েছে। 'বুদবুদ' গল্পে বেলা মনডিয়াল সভ্য সমাজে গৃহীত হয়নি ধর্ষিতা নারী বলে। 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পে জিনি খ্রীষ্টান হওয়ার কারণে হিন্দু অভিজাত সমাজে স্থান পায়নি। 'সাদা কালো' গল্পেও ব্রাত্যজীবনের ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন। এই সকল নারী-পুরুষেরা ধর্মগত কারণে ও আর্থিক মানদণ্ডে সাধারণ মানুষের সমাজে স্থান পায়নি। এদের প্রতি লেখকের অনুরাগ বর্ণিত হয়েছে। লেখক তাদের জীবনযুদ্ধের মাধ্যমে স্বচ্ছ মানবিক প্রত্যয়কে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

এছাড়াও বিমল করের গল্পে কিছু মানুষকে লক্ষ্য করি যারা সমাজ ও পরিবার থেকে নিজেদের ব্রাত্য মনে করেছে। সামাজিক মানুষদের তাদের প্রতি উপেক্ষা, বঞ্চনা তাদের স্থাপিত

করেছে ভিন্নতর জগতে। 'এরা ওরা' গল্পের বৃদ্ধ দম্পতি-- হেমদাকান্ত-সুশীলা, 'তুচ্ছ' গল্পের বরদা-কানন, 'সুখ' গল্পের বরদাকান্ত-সুবর্ণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, গুরুত্ব পায়নি। এঁদের পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূরা দূরত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছে। পারিবারিক জীবনের ভাঙন পরিবারতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণুতা এখানে যেমন কার্যকরী তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের আত্মস্বার্থলোভী মানসিকতার দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে নিঃসঙ্গ জগতে পতিত হয়েছে এই চরিত্রগুলি। যুগজীবনের প্রভাব এই ঘটনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দায়ী তা বলা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিমল করের গল্পে প্রভাব না ফেললেও সমকালীনতার নিরিখে নকশাল আন্দোলনের পরিস্থিতির সাপেক্ষে তিনি কয়েকটি গল্প লেখেন, যেখানে মানবিক মূল্যবোধই বেশি মাত্রায় প্রদর্শিত হয়েছে। 'ওরা', 'সে', 'নিগ্রহ' প্রভৃতি গল্পে সেই মানবিক মূল্যবোধের পতন দেখানোর পাশাপাশি আত্মানুসন্ধানের প্রয়াস চরিত্রগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়েছে।

বিমল কর যে প্রেম মনস্তত্ত্বের ছবি তাঁর গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে মানবিক সম্পর্কের পতনের চিত্র থাকলেও প্রকাশিত হয়েছে সনাতন আদর্শবাদী প্রেমের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। দাম্পত্য সম্পর্ক, মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েনেও লক্ষিত হয়েছে ভালবাসার ইতিবাচক মধুর রূপ। বিশ্বাস, সহযোগিতার মাধ্যমে তা উজ্জ্বলতা পেতে চেয়েছে। অশ্লীলতার আমন্ত্রণে তাঁর গল্প কুলষিত নয়। 'মোহনা' গল্পে দেহ ভোগের কথা বর্ণিত হলেও একটি নারীর ব্যক্তিসত্তার তীব্রতা সেখানে উপস্থিত। অন্তঃসারশূন্য পুরুষদের সান্নিধ্য থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে উদ্দীপ্ত হতে চেয়েছে নারীত্বের অঙ্গীকারে। 'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পেও দুইজন প্রেমিকের মুখ থেকে শিবানীকে দেহভোগের স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষিত হয় শিবানীর বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। অসহায় জীবনে সে পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছে বিবাহিত জীবনের প্রতিশ্রুতিতে, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি তার বন্ধুরা। 'আয়োজন' গল্পে দীর্ঘ সময় ধরে মনোবীণা শারীরিক উদ্দামতা প্রকাশ করতে চেয়েছে পশুপতির কাছে। প্রৌঢ়ত্বে আসীন দাম্পত্যজীবনে সন্তানের জন্য আকাঙ্ক্ষা মনোবীণার মনে তীব্র হয়েছে। মন্ত্রপূতঃ তাবিজ ধারণ করে সে তার স্বামীর সান্নিধ্য চেয়েছে। সঠিক লগ্নে মিলনের আকাঙ্ক্ষা তার কাছে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাই তার মিলনের প্রতি এত আয়োজন, যার মর্মমূলে শুধুমাত্র যৌনতার দাবি ছিল না। বিমল কর সুস্থ-স্বাভাবিক প্রেম ভাবনার দ্বারাই আবর্তিত হয়েছেন। তাঁর গল্পে তাঁর সেই রুচিবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

উপন্যাসের আলোচনায়ও দেখা যায় বিমল কর তাঁর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে দৃষ্টি তা স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'দেওয়াল' উপন্যাসে ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, আতঙ্কগ্রস্ত সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গিরিজাপ্রসাদের রাজনৈতিক ভাবনা সুধা, বাসু, রত্নময়ী প্রমুখের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সুচারু নিখিল অবনীর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ভাবনা তৎকালীন সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে। 'যদুবংশ', 'অসময়', 'নিমফুলের গন্ধ' প্রভৃতি উপন্যাসে তৎকালীন মানুষের ছবি বিশ্বাসযোগ্য ভাবে তাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির নিরিখে বর্ণিত হয়েছে। 'পূর্ণ অপূর্ণ' উপন্যাসটি বিমল করের জীবন ও জগত সম্বন্ধে তাঁর দার্শনিক ভাবনাকে প্রকাশ করেছে। সুরেশ্বর যে জীবনের পূর্ণতা খুঁজতে চেয়েছিল তার কাছে সেই পূর্ণতা ধরা দেয়নি। অপূর্ণতার মধ্যেই পূর্ণতাকে খুঁজে বেড়াতে গিয়ে মানুষ যখন অসহায় হয়ে ওঠে তখন তার কাছে সান্ত্বনা হয়ে আসে মানবিক সম্পর্কের বন্ধন, কর্মযোগের মহান ব্রত। তুচ্ছ, ক্ষুদ্র এই জীবনে আকাঙ্ক্ষাময় পূর্ণতাকে লাভ করা যায় না। তৃপ্ত হতে হয় সীমাবদ্ধতার মধ্যেই। 'খড়কুটো' উপন্যাসে মৃত্যুযন্ত্রণার ক্ষেত্রে উপশম হয়ে এসেছে খ্রীষ্টধর্মের বাণী। যে বাণী মানবিক হৃদয়ের গভীরে আশাবাদ সঞ্চারী। ভালবাসার মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে ভ্রমর কিংবা অমলের মাধ্যমে। 'খোয়াই' উপন্যাসে লেখক অন্ত্যজ শ্রেণীর একটি মানুষের মধ্যে জীবনানুরাগ দ্যোতিত করে তুলেছেন।

বিমল করের উপন্যাসে বিস্তৃত পরিসরে জীবনের অর্থবহতাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস রয়েছে। আমরা জানি ছোটগল্পের থেকেও উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য ও পরিধি সুদূর প্রসারী হয়। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্র উপন্যাসেও পরিলক্ষিত হয়। 'পূর্ণ অপূর্ণ'র সুরেশ্বর, অবনী, 'দেওয়াল' উপন্যাসের গিরিজাপ্রসাদ, সুধা, বাসু, সুচারু, 'দীপ' উপন্যাসের বসুধা, 'হৃদয়তল' উপন্যাসের রজনীকান্ত, প্রতিভা, 'অসময়' উপন্যাসের মোহিনী, 'ভুবনেশ্বরী' উপন্যাসের সোমকান্তি অন্তর্দ্বন্দ্বময় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক একটি কাহিনীকে খাড়া করার চেষ্টা করেছেন এবং সেই কাহিনীর মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে তাঁর চরিত্রগুলি। লেখকের জীবনদর্শন, জগৎ সম্পর্কে ভাবনা কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু কাহিনী বা ঘটনাবৈচিত্র্য অনেক সময়ই তাঁর ছোটগল্পে অনুপস্থিত। 'গল্প বিহীন গল্প' বলার প্রয়াস তাঁর কয়েকটি গল্পের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। এই গল্পগুলিতে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা প্রাধান্য পেয়েছে, এবং তারই নিরিখে গল্পগুলিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মানসিক জগতের রূপ বৈচিত্র। লেখক নিজে বলেছেন--

''একেবারে গোড়ার দিকে গল্প লেখার সময় আমি মনে মনে একটা কাঠামো করে নিতাম। তার পর আর করি না। হালে দশ বারো বছর যা লিখি তার স্পষ্ট কোনো ধারণা আগে থেকে আমার থাকে না। অস্পষ্ট কী যেন একটা মনের মধ্যে গুমরে মরে। একটা তুলনা দিয়ে কথাটা তোমায় বোঝাই। আমার সব সময় মনে হয়েছে, সিস পেনসিলে লেখা অস্পষ্ট খাপছাড়া একটা ঠিকানা যেন কেউ এক টুকরো কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। আমি সেই দুর্বোধ্য, বেয়াড়া, অস্পষ্ট লেখা দেখে দেখে ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছি। এইভাবে হাতড়ে হাতড়ে আমি লিখি, লেখার সময় মাথার মধ্যে কিছু যেন একটা বলার আপ্রাণ চেষ্টা থাকে, কী যেন বলতে চাইছি তাও একেবারে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে আমার কাছে ধরা দেয় না। আমার লেখা তাই বড় বেশী দ্বিধা এবং সংশয়পূর্ণ।''[১১]

লেখকের এই সত্যভাষণের সাথে তাঁর গল্পগুলির যোগ লক্ষ্য করা যায়। ষাটের দশকের পরবর্তীকালে তাঁর গল্পে ঘটনার বৈচিত্র্য থেকেও প্রাধান্য পেয়েছে মানব মন। 'জননী', 'উদ্বেগ', 'অপেক্ষা', 'সংশয়', 'এরা ওরা' প্রভৃতি গল্পে কাহিনী তেমন নেই, যতটা আছে মনোবিশ্লেষণ এবং আইডিয়ার প্রাধান্য। বিশেষ আইডিয়ার দ্বারা লেখক তাঁর গল্পে চরিত্র ও পরিস্থিতি নির্মাণ করেছেন।

বিমল করের সমসাময়িক গল্পকারদের সাথে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশিত হয়েছে তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে। জগদীশ গুপ্তের গল্পে রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে জীবনের যে কদর্য রূপ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল প্রেমের ক্ষেত্রে যৌনতার প্রশ্রয়, মানুষের জীবনের উপর নিয়তির পরাক্রম, এছাড়াও মানব মনের ভোগসর্বস্বতা, স্বার্থপরতা, হীন মনোবৃত্তি। বিমল করকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে এই নেতিবাদিকতাকে অতিক্রম করে ইতিবাচক ভাবনায় আপ্লুত হতে দেখা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে গ্রামীণ জীবন, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও বণিকতন্ত্রের উদ্ভবের যে যুগ পরিবর্তনের ছবি পাওয়া যায়, বিমল করের গল্পে তা অনুপস্থিত। তাঁর গল্পেও যুগের ছবি অঙ্কিত তবে তা স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের চারিত্রিক, ভাবনাগত, আত্মানুসন্ধানগত পার্থক্যের মাধ্যমে বর্ণিত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী মানুষের ছবি বিমল করের গল্পে পৃথক ভাবে এসেছে। তাঁর চরিত্রগুলি বাইরের জগতের থেকে অন্তর্জগতের যুদ্ধেই অধিকমাত্রায় ব্রতী হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে যে কাহিনী-প্রাধান্য লক্ষিত হয় তার প্রতি সর্বদা বিমল কর উৎসাহী হননি। তাঁদের গল্পের চরিত্রগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও

বিমল করের গল্পে চরিত্রগুলিতে মনস্তাত্ত্বিকতার মত গূঢ় ও নিবিড় আবেদন অন্য মাত্রা দেয়। বিমল কর গূঢ়ভাষী লেখক এবং তাঁর গল্পে মূলত মানুষের অন্তরজগতের আলো-ছায়াময় জগৎ প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর গল্পে শ্রেণীগত সমস্যা সর্বদা তীব্র হয়ে আসেনি। প্রথমদিকের 'মানবপুত্র', 'আঙুরলতা', 'বরফ সাহেবের মেয়ে' গল্পে এই প্রবণতা থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনকেই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী, কমলকুমার মজুমদার প্রমুখের গল্পে ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণুতা যেমন ভাবে গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে, তার সাথে বিমল করের গল্পের মিল লক্ষিত হয় বটে তবে বিমল করের গল্পে আত্মিক উন্নতির বাসনায়, স্বীকারোক্তির প্রবণতায় চরিত্রগুলি বহুক্ষেত্রেই সঠিক পথের দিশা খুঁজে পেয়েছে। বিমল করের 'উপখ্যান মালা' গ্রন্থের গল্পগুলিতে এই ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়।

'ছোটগল্প : নতুন রীতি' আন্দোলন বিমল কর সংগঠিত করে তোলেন। এই আন্দোলনের সাপেক্ষে যে গল্প সংকলনগুলি প্রকাশিত হয় সেখানে তাঁর গল্প না থাকলেও তিনি এই আন্দোলনের মাধ্যমে লেখকের সচেতন ইচ্ছা ও প্রয়াসকে রূপ দিতে চেয়েছেন। এই আন্দোলনের ইস্তেহারে তিনি লেখেন -- ''ছোটগল্প : নতুন রীতি'র সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট তাঁরা সবিনয়ে শুধু এইটুকু বলবেন : আমরা আমাদের মনোমত করে গল্প লিখতে চাই, যে লেখা সাধারণত চলিত পত্রিকাগুলির পক্ষে ছাপা সর্বদা সম্ভব নয়। বস্তুত এই কারণেই আমাদের এই গ্রন্থমালা, যার পাঠক স্বল্প, সহানুভূতিশীল এবং পরীক্ষামূলক রচনার প্রতি শ্রদ্ধাবান।''[১২]

বিমল কর তাঁর লেখক জীবনে ছোটগল্পের প্রতি অনুরাগবশত বহু পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। বার বার পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এই প্রয়াস তাঁর অবসর জীবনে 'গল্পপত্র' নামক গল্পের পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমেও ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু বিমল কর তাঁর সমকালে আরও কিছু গল্প আন্দোলন, যেমন --হাংরি জেনারেশন, নিম সাহিত্য, শাস্ত্র বিরোধী, গণতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী প্রভৃতি গল্প আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন নি। জীবনের শুভবোধের প্রতি আস্থা রেখে তার প্রতিফলনও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন সাহিত্যের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায় বিমল করের গল্পে যে চরিত্রগুলি এসেছে তারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি। কেষ্ট, গুণেন, বরদা, সুধাময়, শ্যামল, পূর্ণেন্দু, মৃণাল, নিশীথ বরদা, হেমদাকান্ত, শৈল, কানন, উমা, হৈমন্তী, ফুল্লরা, শিবানী, মোহনা এই সব নামকরণের মধ্যে যেমন সারল্য রয়েছে

তেমনি তাদের জীবনধারণের প্রবণতাও সরল, স্বভাবিক। তবুও অবচেতন মনের দ্বারা তাড়িত হয়ে তারা সৃষ্টি করে ফেলেছে একটা মনস্তাত্ত্বিক জগৎ, যে জগতে সে একা, বন্ধুহীন, পরিজনহীন। আধুনিক জীবনের জটিলতার আবর্তে এই চরিত্রগুলিও এসে পড়েছে। লেখক তাদের জীবনাকাঙ্ক্ষার পথের পথিক করে তুলেছেন তাদের আত্ম আবিষ্কারের সৎ প্রচেষ্টায়। তাদের জীবনের গভীরে জীবনবাদী প্রত্যয়ের সন্ধানই লেখকের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের সাথে একাত্ম হয়ে উঠেছে। লেখকের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এই অনুসন্ধানের কথাই তাঁর ছোটগল্প ও কয়েকটি উপন্যাসের সমালোচনার মাধ্যমে রূপায়িত করতে চেয়েছি।

উৎস পরিচয়

১. ছোটগল্পের সীমারেখা--নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাকসাহিত্য, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-১৭

২. 'নিশীথ সঙ্গী'- 'শেষ বেলার গল্প'-- বিমল কর, প্রকাশক-রণধীর পাল, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-২০৬

৩. 'সংশয়'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৭০

৪. 'সুখ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৬৬

৫. 'তুচ্ছ'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৫৮০

৬. 'মোহনা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪৭৫

৭. 'ফ্রয়েড জন্মশতবার্ষিকী'--বিমল কর, সাপ্তাহিক 'দেশ', ১২ই মে, ১৯৫৬, পৃষ্ঠা-১৭২

৮. 'অপেক্ষা'--'বিমল করের পঞ্চাশটি গল্প'--বিমল কর, আনন্দ পাব. প্রাঃ লিঃ, ২০০১, পৃষ্ঠা-৩৩৬

৯. 'লেখকের কৈফিয়ত'-'নির্বাচিত গল্প'--বিমল কর, অনন্য প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৪-৫

১০. 'মৃত্যু ইচ্ছা'--বিমল কর, সাপ্তাহিক 'দেশ', ৪ঠা জুন, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা-৪৫০

১১. 'লেখকের কৈফিয়ত'-'নির্বাচিত গল্প'--বিমল কর, অনন্য প্রকাশনী, ১৯৭৩, পৃষ্ঠা-৬

১২. 'ছোটগল্প : নতুন রীতি', বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক--সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইমপ্রেশন, ১৪০০, পৃষ্ঠা-২৯

****